# ইন্টারনেটের প্রকৃত ইতিহাস

নাফিস ইফতেখার

# ইন্টারনেটের প্রকৃত ইতিহাস

প্রথম প্রকাশঃ www.Somewhereinblog.net

গ্রন্থনাঃ নাফিস ইফতেখার

- ব্রাউসার যুদ্ধ
- সার্চ ইঞ্জিন
- ইন্টারনেট ব্যবসা - ডট কম বাবল
- ওয়েব বিপ্লব

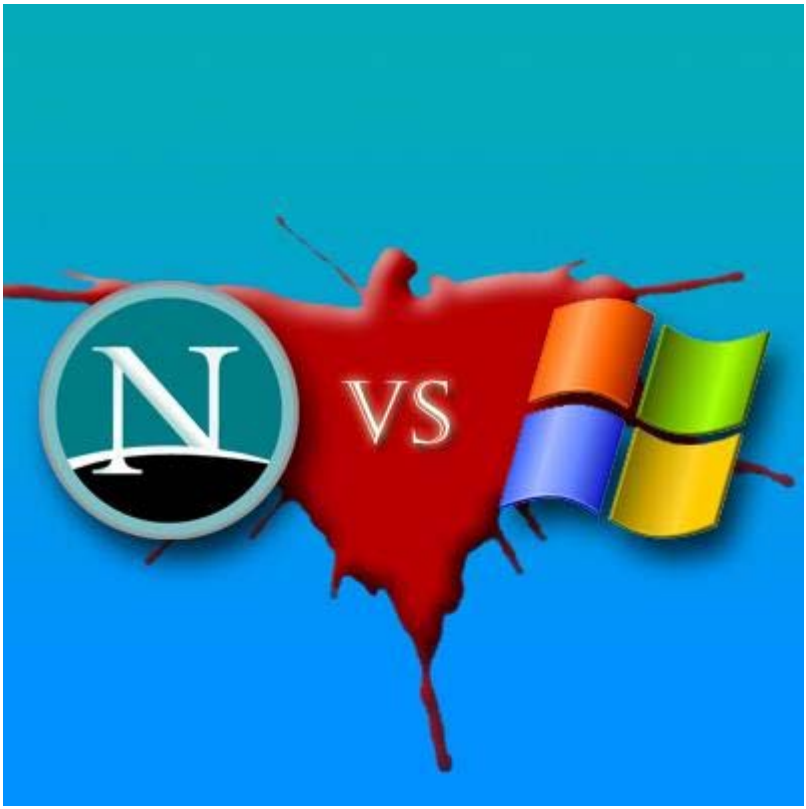


## ব্রাউসার যুদ্ধ (মূল লেখাটি এখানে):

প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করছি। ভিডিও বা ছবি দেখছি, গান ডাউনলোড করছি। ইন্টারনেট এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু কতজন ভেবে দেখেছি বা অন্ততঃ জানার চেষ্টা করেছি এই ইন্টারনেটের আদি অবস্থা সম্পর্কে? কতজনই বা জানি ইন্টারনেটের ইতিহাস সম্পর্কে?

৯০' এর দশকের গোড়ার দিকে কথা। তখনকার ইন্টারনেট আজকের ইন্টারনেটের থেকে ছিলো পুরোপুরি ভিন্ন। তখনকার ইন্টারনেট ছিলো মূলতঃ একটি গবেষণাধর্মী নেটওয়ার্ক যা

বছর কয়েক আগে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী টিম বার্নার্স লি উদ্ভাবন করেছিলেন। ওই সময় ওয়েবসাইটের সংখ্যা ছিলো হাতে গোণা। আর যাও বা ছিলো তাতে ছিলো শুধু লাইনের পর লাইন বিরক্তিকর গবেষণাধর্মী লেখা। একান্তই "গিক" (Geek-টেকনোলজি বিষয়ক আঁতেল) না হলে কেউ সেই সময়কার ইন্টারনেট নিয়ে মাথা ঘামাতো না। সৌভাগ্যবশত সেরকমই কিছু গিকদের মধ্যে দু'জন ছিলেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র মার্ক এন্ড্রিসেন ও এরিক বিনা

*মার্ক এন্ড্রিসেন*

এন্ড্রিসেন ও এরিক বিনা সেই সময়ই কল্পনা করেছিলেন এমন একদিন আসবে যেদিন আমার ও আপনার মতো সাধারণ মানুষও ইন্টারনেটকে প্রাত্যহিক কাজে ব্যবহার করবে। তারা হয়তো সময়ের তুলনাই স্বপ্ন একটু বেশিই দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের সাথে এই একই স্বপ্ন দেখার দলে শামিল হয় তাদেরই আরো কিছু সহপাঠী। এন্ড্রিসেন, বিনা ও তার বন্ধুরা মিলে দিনরাত নিরলস প্রোগ্রামিং করছিলেন, ইন্টারনেটকে করে তুলছিলেন ইমেজ, অডিও আর ভিডিও কম্পাটিবল। সবসময়ই তারা সুযোগ খুঁজছিলেন কিভাবে ওয়েবকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, কিভাবে একে সাধারণ মানুষের কাছে আরো সহজবোধ্য করে তোলা যায়। আর এই পরিশ্রমেরই ফসল হলো বিশ্বের প্রথম গ্রাফিকাল ওয়েব ব্রাউসার "মোজাইক (Mosaic)" । জেনে রাখুন, আজকে আপনি ওয়েব

ব্রাউসিংয়ের জন্য যেই ওয়েব ব্রাউসারই ব্যবহার করুন না কেন, তা হচ্ছে এন্ড্রিসেন-বিনা'র আবিষ্কৃত সেই মোজাইক ব্রাউসারেরই কোন উত্তরসূরী। ইন্টারনেটের ইতিহাসে মোজাইকের আগমন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেননা মোজাইকের আগমণের মধ্য দিয়ে ইন্টারনেট প্রথমবারের মতো রিসার্চ নেটওয়ার্ক আর বিজ্ঞানীদের যন্ত্রের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিলো, পরিণত হয়েছিলো তথ্য-সম্প্রচারের আরেকটি মাধ্যমে। ১৯৯৩ সালের শেষের ভাগে মোজাইকের একটি বেটা ভার্শন ইন্টারনেটে বিনামূল্যে ডাউনলোডের জন্য দেয়া হয়। মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পরে পুরো বিশ্বে অনেকটা ভাইরাসের মতো।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রতিদ্বন্দী থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর সেই সময় মাইক্রোসফটের চাইতে বড় প্রতিদ্বন্দী আর কেইবা হতে পারতো। কিন্তু মাইক্রোসফটের প্রতিদ্বন্দী হয়ে ওঠার ক্ষমতা মোজাইক তখনো লাভ করেনি, তার জন্য প্রয়োজন ছিলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আর টাকা.....অনেক অনেক টাকা। যাক সে কথায় পরে আসছি। তখনো পর্যন্ত মোজাইক ছিলো কিছু বিশোর্ধ ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রের শখের আবিষ্কার। কিন্তু এই সখের আবিষ্কার বিনিয়োগকারীদের সুনজরে পড়তে সময় লাগেনি। সেই বিনিয়োগকারীদেরই একজন ছিলেন জিম ক্লার্ক।

*জিম ক্লার্ক*

জিম ক্লার্ক ছিলেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্সের প্রভাষক। ক্লার্ক ছিলেন বিখ্যাত "সিলিকন গ্রাফিক্সের" প্রতিষ্ঠাতা। সিলিকন গ্রাফিক্সের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ক্লার্ক পেয়েছিলেন ব্যাপক সুখ্যাতি আর আয় করেছিলেন অনেক টাকা। কিন্তু সিলিকন গ্রাফিক্সের পর জিম ক্লার্ক চাইছিলেন নতুন ও বড় কোন প্রজেক্ট। যখন তিনি মোজাইকের কথা শুনলেন ক্লার্ক বুঝে গেলেন তিনি যা খুঁজছেন তা তিনি পেয়ে গিয়েছেন। ৯৪' সালের এর ফেব্রুয়ারীতে মার্ক এন্ড্রিসেন জিম ক্লার্কের কাছ থেকে একটি ইমেইল পান যেখানে বলা হয়েছিলো ক্লার্ক নতুন একটি সফটওয়্যার কোম্পানী খুলতে চান এবং এন্ড্রিসেনকে সেখানে পেলে তিনি বড়ই খুশি হবেন। এন্ড্রিসেন তখন মাত্র গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছেন। সুতরাং এরকম একটি অফার পেয়েও না বলার প্রশ্নই ওঠে না। শীঘ্রই এন্ড্রিসেন তার দলবল নিয়ে জিম ক্লার্কের সাথে দেখা করেন। এন্ড্রিসেন আর ক্লার্কের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা চলে কিভাবে মোজাইককে একটি লাভজনক প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা যায়।

যদিওবা জিম ক্লার্ক বুঝতে পেরেছিলেন ইন্টারনেটের অপার সম্ভাবনার কথা, কিন্তু অনেকেই ছিলেন যাদের মাথায় এই সহজ-সরল কথাটি তখনো ঢোকেনি। সেই না-বোঝার দলে এমন একজন ছিলেন যার কথা শুনলে আপনি ভুরু কপালে তুলবেন - বিল গেটস!

*বিল গেটস*

*বিল গেটস ও পল এ্যালোন*

বিল গেটসের কথা আমরা কে না জানি। বিল গেটস ছিলেন "মাইক্রোসফটের (Microsoft)" সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও CEO (অপর প্রতিষ্ঠাতা পল এ্যালোন)। তখন যুগটা ছিলো মাইক্রোসফটের। বিল গেটসের তথা মাইক্রোসফটের স্বপ্নটা ছিলো খুব সোজা সাপটা কিন্তু বৃহৎ - পৃথিবীর প্রতিটি অফিস, বাসা-বাড়ির কম্পিউটার চলবে মাইক্রোসফট উইন্ডোজের অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা। ১৯৯৩ এ গেটস এই স্বপ্ন পূরণের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলো যখন পৃথিবীর প্রায় ৯০% পিসি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা চালিত হচ্ছিলো। আর এই স্বপ্ন পূরণ করার কাজটি মাইক্রোসফট করছিলো বেশ শক্ত হাতে। আর এই কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিল গেটস - মাইক্রোসফটের তুখোড়ের চেয়েও তুখোড় সেই ব্যাক্তিটি, যিনি তার শক্ত ও রূঢ় মানসিকতার জন্য পরিচিত ছিলেন। আরেক কথায় বোকাদের জন্য কোন স্থান মাইক্রোসফটে ছিলো না। মাইক্রোসফট কখনোই তার প্রতিদ্বন্দীদের সাথে বালখিল্যতায় মেতে ওঠেনি, বরং সবসময়ই চেষ্টা করেছে কৌশলে তাদেরকে নির্মূল করতে। এমনকি Lotus , Word Perfect , Borland , IBM এর মতো পরাক্রমশালী সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানকেও মাইক্রোসফটের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিলো। বিল গেটস নিজে জানতেনও তার ক্ষমতা সম্পর্কে। একরাতে এক ডিনার পার্টিতে বিল ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট ইলেকশন নিয়ে কথা চলছিলো। কথায় কথায় বিল গেটস হঠাৎই বলে ওঠেন - "আমিও ক্ষমতার দিক দিয়ে

প্রেসিডেন্টের চাইতে কম না.....''। কথাটা বলা মাত্রই বিল গেটসের স্ত্রী তাকে টেবিলের নিচে পা দিয়ে খোঁচা দিয়ে থামিয়ে দেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি - বিল গেটস হয়তো খুব একটা ভুল বলেননি! এক মাইক্রোসফট কর্মীর মতে - ''যদি গেটসের সাথে আপনি আধাঘন্টার মিটিং করেন এবং কমপক্ষে ১৫ বার Idiot কথাটা না শুনেন তাহলে বুঝবেন যে আপনি সফল!'' আপনি স্মার্ট নাকি হ্যান্ডসাম এটা কোন বিবেচ্য বিষয় ছিলোনা মাইক্রোসফটের কাছে। মেধাকে তারা আর যেকোন কিছুর চাইতে উপরে স্থান দিতো। আর তাই হয়তো তৎকালীন মাইক্রোসফটের কর্মীদের গড় বয়স ছিলো মাত্র ২৬ বছর। মাইক্রোসফটের মেধাবী এই কর্মীবাহিনী, ব্যাংকে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা আর উইন্ডোজ ৯৫ এর অতি শীঘ্রই বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা - বিল গেটস স্বপ্ন দেখছিলেন টেকনোলজি ভুবনের অজেয় সম্রাট হবার। সব মিলিয়ে গেটস বেশ সুখেই ছিলেন বলতে হবে। কিন্তু মাইক্রোসফটের এ সাফল্য একদিনে আসেনি। গেটস নিজেও জানতেন, যেভাবে অদম্য সাহস আর মেধাকে সম্বল করে তার নিজের হঠাৎ উত্থান ঘটেছিলো, ঠিক তেমনিভাবেই, যেকোন সময় তাকে টেক্কা দেবার মতো লোকের আবির্ভাব ঘটতে পারে।

ওদিকে জিম ক্লার্ক, মাইক এন্ড্রিসেন ও তার দলবল তখনো ব্যস্ত মোজাইককে আরো উন্নত এবং সর্বোপরি লাভজনক করে তুলতে। প্রজেক্টের নতুন নামও দেয়া হয় - নেটস্কেপ (Netscape)। আসলে ক্লার্ক চাইলেও হয়তো অস্বীকার করতে পারবেন না যে তার আগ্রহ যতোটা না প্রযুক্তিটাকে উন্নত করাতে ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো এক লাভজনক করে তুলতে। যদিও গেটস নেটস্কেপের সাফল্যের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন, তথাপি মাইক্রোসফটের কিছু কর্মী সমূহ বিপদের গন্ধ ঠিকই পাচ্ছিলেন। এমনই এক কর্মী অনেকটা বন্ধুসুলভ মনোভাব থেকেই নেটস্কেপের কাছে ফোন দেন, কথা বলেন ওখানকার একজন এক্সিকিউটিভের সাথে। কিন্তু মাত্র ১৫ মিনিট কথা বলে ফোন রেখে দেয়া হয় এবং নেটস্কেপের কাছ থেকে প্রায় ইঙ্গিতপূর্বকভাবে বলে দেয়া হয় - ''আমাদের কোন আগ্রহ নেই এবং ভবিষ্যতে আর ফোন করার চেষ্টাও কোরো না.....''। এ ঘটনায় মাইক্রোসফট হয়েছিলো বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেখানে ''মাইক্রোসফটের ফোন এসেছে!'' বলে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে, নেটস্কেপের মধ্যে এমন কোন ভাবই ছিলো না। মাইক্রোসফটও বুঝে নেয়

নেটস্কেপ এখন থেকেই তাদেরকে শত্রুবলে ভাবতে শুরু করেছে।

অবশেষে ১৯৯৪ সালের ১৩ই অক্টোবর, মাসের পর মাস কোডিং আর প্রোগ্রামিংয়ের পর, এন্ড্রিসন বাহিনী তাদের উদ্ভাবিত নতুন ব্রাউসার নেটস্কেপ ন্যাভিগেটর (Netscape Navigator) বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। যেমনটা আশা করা গিয়েছিলো, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নেটস্কেপ ব্যপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ১০ লক্ষ ডাউনলোড সীমা ছাড়িয়ে যায়। এর আগে বিশ্ববাসী আর কোন সফটওয়্যারের এমন বিপুল জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করেনি। আর অনেকটা অবধারিতভাবেই এই জনপ্রিয়তা নেটস্কেপের জন্য বয়ে নিয়ে আসে প্রতিদ্বন্দীতার খরস্রোত। মাইক্রোসফট নেটস্কেপের এই অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে হয়ে গিয়েছিলো নির্বাক ও অনেকটাই ভীত। নির্বাক - কারন তাদের কাছে ছিলো না নেটস্কেপের বিপরীতে কোন জবাব। আর ভীত - কারন মাইক্রোসফট নেটস্কেপকে দেখছিলো একটি বিকল্প সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে। যেমন করে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে সর্বোচ্চ সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম, যার ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য সফটওয়্যার চালানো হয়। মাইক্রোসফট ওয়েবকে কল্পনা করেছিলো আরেকটি নতুন সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে, যেখানে মানুষ ইন্টারনেটে থেকেই সব ধরনের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার চালাবে আর যাবতীয় কম্পিউটার চাহিদা মেটাবে। নেটস্কেপকে তারা দেখেছিলো সেই প্ল্যাটফর্মের চালক হিসেবে। আর তাই মাইক্রোসফটের ভয়টা অমূলক ছিলোনা মোটেও।

অনেকটা হঠাৎ করেই বিল গেটসের মাথায় ইন্টারনেটের গুরুত্বটা খেলে যায়। একরাতে বিল গেটস তার সকল কর্মীকে একটি ইমেইল করেন। সে ইমেইলে তিনি ইন্টারনেটকে অভিহিত করেন পিসির পর দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসেবে। নেটস্কেপের ব্যাপারে তিনি বলেন, নেটস্কেপ হলো সেই কোম্পানী যার সাথে মাইক্রোসফটের অব্যশই তাল মেলাতে হবে ও ভবিষ্যতে ছাড়িয়ে যেতে হবে। নেটস্কেপ খুব ভালোভাবেই জানতো বিল গেটস প্রতিশোধ নেবেন এবং যখন নেবে সে অনুভূতি খুব একটা সুখকর হবে না। আর এজন্যেই তারা ভাড়া করে সিলিকন ভ্যালির Lawyer গ্যারি রিব্যাককে যিনি বিখ্যাত ছিলেন মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হয়ে মামলা লড়ার জন্য।

*গ্যারি রিব্যাক*

এরই মধ্যে মাইক্রোসফট কর্তৃপক্ষ তাদের একটি বিশেষ টিম পাঠান নেটস্কেপ কার্যালয়ে এক বিশেষ রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসার জন্য। ৬ ঘন্টা দীর্ঘ এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কি ঘটেছিলো তা নিয়ে অনেক অনেক বিতর্ক আছে। তবে মাইক্রোসফটের মতে, এই ৬ ঘন্টা তারা নেটস্কেপের টেকনিক্যাল টিমের সাথে এক বন্ধুসুলভ ও প্রাণবন্ত আলোচনায় মেতে উঠেছিলো। কিন্তু নেটস্কেপ বলে যে, মাইক্রোসফট তাদের কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো, মাত্র ১০ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে নেটস্কেপকে কিনে নেবার জন্য। যদি নেটস্কেপের দাবী সত্য হয়ে থাকে

তবে মাইক্রোসফট প্রকৃতপক্ষে আইন ভঙ্গ করেছিলো, আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে মাইক্রোসফট ভঙ্গ করেছিলো "এ্যামেরিকান এন্টি ট্রাস্ট ল" (American Anti Trust Law)। এই আইনে বলা আছে, কোন প্রতিষ্ঠান তার কোন একটি পণ্যের একচেটিয়া বাজারের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে অপর আরেকটি পণ্যেকে লাভজনক করতে পারবে না। যে একচেটিয়া বাজারের কথা এখানে বলা হচ্ছে, বিশেষজ্ঞদের মতে তা মাইক্রোসফটের ছিলো তাদের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের বদৌলতে। ঐ বিতর্কিত মিটিংয়ের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নেটস্কেপ US Justice Department কে মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে এ্যান্টি ট্রাস্ট কাউন্সিল গঠনের অনুরোধ করে। মাইক্রোসফট নেটস্ক্যাপের পক্ষ হতে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া সব অভিযোগ অস্বীকার করে।

প্রতিষ্ঠান গঠনের মাত্র ১ বছরের মাথায়ই নেটস্কেপ বাজারে তাদের শেয়ার ছাড়ে। মুহূর্তেই নেটস্কেপ অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে সর্বকালের সর্বাধিক দ্রুত বর্ধনশীল সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নেটস্কেপ নিজেদেরকে অজেয় ভাবতে শুরু করে। সাফল্যের ছোঁয়া লেগেছিলো এড্রিসেন বাহিনীর জীবনেও। মুহূর্তেই টাকার সাগরে ভাসতে থাকেন তারা। ওদিকে সাফল্যের খুশিতে অন্ধপ্রায় এবং অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী জিম ক্লার্ক মিডিয়ার কাছে মাইক্রোসফট ও উইন্ডোজকে ক্রমাগত সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করছিলেন। তার করা উক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটি হলো - "Windows will be a poorly debugged set of device drivers"। উক্তিটি শুনতে হয়তো আপনার আমার কাছে অতোটা খারাপ লাগছে না। কিন্তু বিল গেটসের কাছে এই উক্তিটি হচ্ছে অনেকটা তার মায়ের নাম তুলে গালি দেয়ার শামিল।

অবশেষে মাইক্রোসফট ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ এ মাইক্রোসফট তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত ব্রাউসার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার (Internet Explorer) বাজারে ছাড়ে। দিনটা ছিলো ঐতিহাসিক পার্ল হারবার (Pearl Harbor) আক্রমণের দিন। ঐ রাতে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক পার্টি শেষে মাইক্রোসফটের টেকনিক্যাল টিমের কিছু সদস্য ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের একটি বিশাল "e" আকৃতির লোগো পিকআপে ভ্যানে তুলে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত নেটস্কেপের কার্যালয়ের সামনে ফেলে রেখে আসেন।

*সেই বিশালাকৃতির "e" চিহ্নিত ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের লোগোটি*

এই ঘটনার মাধ্যমে মাইক্রোসফট যেন অনেকটা যুদ্ধের দামামা-ধ্বণি বাজালো এর মাধ্যমে। মাইক্রোসফটের পরিকল্পনা ছিলো খুব সোজা। নেটস্কেপের প্রতিটা পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করা আর তার পুনরাবৃত্তি করা, আরো সোজা ভাষায় বলতে গেলে অনুকরণ করা। অনুকরণ বলুন আর কৌশল, মাইক্রোসফট ধীরে ধীরে তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে শুরু করলো। এমনকি মাইক্রোসফট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারকে উইন্ডোজের সাথে বিনামূল্যে বিতরণ করতে শুরু করলো। মাইক্রোসফট তথা বিল গেটস তার প্রভাব খাটিয়ে সফটওয়্যার বিতরণকারী এজন্টদেরকে হাত করে ফেললেন ও ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য ও নেটস্কেপকে সর্বস্বান্ত করতে সম্ভাব্য সব কিছু করলেন। ধীরে ধীরে নেটস্কেপের শেয়ার মূল্য কমতে আরম্ভ করলো। অনেকটা হতভম্ব নেটস্কেপ তাদের শেষ চালটি চাললো। শুরু হলো মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে আনা এ্যান্টি ট্রাস্ট মামলার শুনানি। এই শুনানিতে বিল গেটসকে ঘন্টার ঘন্টা এবং মাসের পর মাস ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তার প্রতিটি জবাব ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়।

*চলছে জিজ্ঞাসাবাদ*

জিজ্ঞাসাবাদকালে বিল গেটস তাদের ও নেটস্কেপের মধ্যে সেই বিতর্কিত রুদ্ধদ্বার বৈঠকের কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ মাইক্রোসফটের কর্মীদের কাছে তারই করা একটি ইমেইলে বৈঠকের উল্লেখ দেখানো হলে গেটস নিশ্চুপ হয়ে যান। এই পুরো জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়াটি গেটসকে মানসিকভাবে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিলো। গেটস কোন কোন প্রশ্নের জবাবে শিশুর ন্যায় আচরণ করেছেন। একবার তাকে একটি জিজ্ঞাসাবাদ-ফর্ম পূরণ করতে দিলে বিল গেটসকে বিচারক ফর্মে তার একটি উত্তর নিয়ে জিজ্ঞেস করলে গেটস বলেন:

বিল গেটস: "আমি ওটা টাইপ করিনি....."
বিচারক: "কে টাইপ করেছে?"
বিল গেটস: "কম্পিউটার।"

এমনকি একবার এক বোর্ড মিটিংয়ে বিল গেটসকে অশ্রুসজল অবস্থায়ও দেখা যায়। আসলে কোনোদিন কারো প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য না থাকা বিল গেটসকে হঠাৎ করেই এমন সব প্রশ্ন করা হচ্ছিলো যার জবাব তিনি এড়িয়ে যেতে পারছিলেন না। আর এই জিনিসটাই বোধোহয় তাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিলো।

সবকিছু পর্যালোচনা শেষে আদালত বিল গেটস ও মাইক্রোসফট কর্পোরেশনকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করে এবং কোম্পানী দুই ভাগে ভাগ করে দেবার সিদ্ধান্ত দেয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে মাইক্রোসফট শেয়ার বাজারে একদিনের মধ্যেই প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার হারায়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৮ এ বিল গেটস মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের দায়ভার স্টিভ বালমারের হাতে ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। এই ঘটনার পর মানসিকভাবে বিল গেটস পুরোপুরি বদলে যান। অফিসের কাজের পাশাপাশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন দাতব্য সংস্থার কার্যক্রম নিয়ে। অনেকের মতেই ব্রাউসার যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি। ২য় ব্রাউসার যুদ্ধ বর্তমানে চলছে ফায়ারফক্স আর ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের মধ্যে।

* *ডিসকভারি চ্যানেলে প্রচারিত Download - The True History of Internet অনুষ্ঠান অবলম্বনে রচিত।*

* ব্রাউসার যুদ্ধ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে যেতে পারেন উইকিপিডিয়ার এই লিংকে: View this link

## সার্চ ইঞ্জিন (মূল লেখাটি এখানে):

আজকের এই ইন্টারনেটে আপনি যেকোন একটি সার্চ ইঞ্জিনে "বারাক ওবামা" লিখে সার্চ দিন। আমি নিশ্চিৎভাবে বলতে পারি আপনি বারাক ওবামা সম্বন্ধে যা যা জানতে চান তার অধিকাংশ তথ্যই পেয়ে যাবেন। যে প্রযুক্তির বলে সার্চ ইঞ্জিনগুলো প্রায় ১৫৬ মিলিয়নের বেশি ওয়েবসাইট আর বিলিয়ন বিলিয়ন ওয়েবপেইজের মধ্য থেকে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যটি প্রায় নিখুঁতভাবে খুঁজে এনে দেয় তা অনেকটা বিস্ময়করই বটে! প্রযুক্তি বিস্ময়কর হতে পারে, কিন্তু এই বিস্ময়কর প্রযুক্তির ওপর আজ আমরা যে পরিমাণে নির্ভরশীল তা কিন্তু মোটেও বিস্ময়কর নয়। প্রায়শঃই আমরা ভুলে যাই যে মাত্র ১১ বছর আগেও ইন্টারনেটে ওয়েবপেইজগুলো পূর্ণ ছিলো লাইনের পর লাইন শুধু লেখা আর লেখা দিয়ে, ছিলোনা গুগোলের মতো সার্চ ইঞ্জিন। আর তারও ৫ বছর আগে ইন্টারনেটে ছিলোনা সার্চ নামক কোন বস্তু। ইন্টারনেটে আপনি যা চাইছেন তা খুঁজে পাওয়া ছিলো প্রায় অসম্ভবের ধারে কাছে। সর্বোচ্চ যা করা সম্ভব ছিলো তা হলো লিংকের পর লিংক ক্লিক করে যাওয়া, আর আশা করা যে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যটি পেয়ে যাবেন।

এ শুধু সার্চ ইঞ্জিনের গল্পগাঁথা নয়, এ এক রোমাঞ্চকর ইতিকথা যার প্রতিটি মুহূর্ত আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে সেইসব কৃতি মানুষদের কথা, আধুনিক ইন্টারনেটের বিকাশে যাদের ভূমিকা আর অবদান কখনোই ভোলবার নয়।

সিলিকন ভ্যালির নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সান ফ্রান্সিসকো শহরের দক্ষিণ দিকের একটি অংশই হলো সিলিকন ভ্যালি। সিলিকন ভ্যালির "সিলিকন" শব্দটি এসেছিলো ভ্যালিতে অবস্থিত জগদ্বিখ্যাত সব সিলিকন চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে। তবে এখন অবশ্য "সিলিকন" শব্দটা ভ্যালির সামগ্রিক রূপকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর কেনই বা হবে না? সিলিকন ভ্যালিতে অবস্থিত Adobe, Apple Inc, eBay, Google, Hewlett-Packard (HP), Intel, Nvidia, Oracle, Yahoo!, Advanced Micro Devices (AMD) Symantec, Sun Microsystems, Asus, Facebook, McAfee, Opera Software, Siemens, Sony প্রভৃতি বিখ্যাত সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সদরদপ্তর। সিলিকন ভ্যালি হচ্ছে পৃথিবীর সব টেকিদের (Techie-টেকনোলজি সংক্রান্ত কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি) কাছে স্বপ্নের জগৎ। এখানে মেধার মূল্য অনেক। এখানে

একটি ভালো আইডিয়া পেলে তার জন্য টাকা ঢালার জন্য মুখিয়ে আছেন সব ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টরা (Venture Capitalist-নবীন কিন্তু সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকারী)। মেধা, আইডিয়া আর কর্মদক্ষতার এমন মূল্যায়ন পৃথিবীর আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই সিলিকন ভ্যালির বিখ্যাত সব আইডিয়াগুলোর কেন্দ্র বা উৎস কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান নয়, বরং তা হলো স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি। আর এই স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকেই ইন্টারনেটে আধুনিক সার্চ ব্যবস্থার পদযাত্রার শুরু।

*জেরি ইয়াং ও ডেভিড ফাইলো*

১৯৯৪ সালের কথা। এই স্ট্যানফোর্ডেরই দু'জন ছাত্র ছিলেন জেরি ইয়াং (Jerry Yang) আর ডেভিড ফাইলো (David Filo) । তাদেরই এক প্রফেসর যখন ১ বছরের জন্য ছুটিতে চলে যান, জেরি আর ডেভিড সেই প্রফেসরের কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যান। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে করতে নিজের অজান্তেই জেরি আর ডেভিড এমন একটি আইডিয়া পেয়ে যান যা ছিলো সার্চ ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ। আজ জেরি আর ডেভিডের নিজস্ব একটি কোম্পানী আছে: ইয়াহু!(Yahoo!) , যা পৃথিবীর অন্যতম জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ও

দ্বিতীয় বৃহত্তম সার্চ ইঞ্জিন। আর এসব কিছুর শুরু তখন যখন জেরি ও ডেভিড স্ট্যানফোর্ড ফ্যান্টাসি বাস্কেটবল লীগ জেতার জন্য ইন্টারনেটকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে উপায় খুঁজছিলেন। ফ্যান্টাসি বাস্কেটবল লীগ প্রকৃতপক্ষে কোন বাস্কেটবল লীগ নয় বরং এটিকে বলা যেতে পারে একধরনের ভার্চুয়াল প্রতিযোগিতা। এতে কিছু বাস্তব খেলোয়াড়ের নামের সমন্বয়ে একটি বাস্কেটবল টিম গঠন করতে হতো ও সেই টিমটি নিবন্ধন করতে হতো। অতঃপর টিমের খেলোয়াড়রা বাস্তব বাস্কেটবল ম্যাচে যে পয়েন্ট অর্জন করতো তা দিয়ে ফ্যান্টাসি বাস্কেটবল লীগের প্রতিটি দলের মোট পয়েন্ট নির্ধারিত হতো। এক্ষেত্রে সাফল্যের মূলমন্ত্র ছিলো, ভালো খেলোয়াড় নির্বাচন করা এবং ফর্মে থাকা খেলোয়ারকে দ্রুত দলে নিয়ে আসা ও ফর্মহীন খেলোয়াড়দেরকে দল থেকে অপসারণ করা। আর এই কাজটি যে দল আর সবার আগে করতে পারতো স্বভাবতই তারাই সাফল্য পেতো। অন্যান্য টিম যেখানে পরদিনের সংবাদপত্রের পাতা ঘেঁটে ম্যাচের স্কোর জেনে তারপর দলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতো, জেরি আর ডেভিড পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলেন না। তারা চাইলেন কিভাবে তার আগেই ম্যাচের রাতেই তারা এ কাজটি আর সবার আগে করে ফেলতে পারেন। আর এজন্যে তারা শরনাপন্ন হলন ইন্টারনেটের। ঘন্টার পর ঘন্টা ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘেঁটে ঘেঁটে তারা সাম্প্রতিকতম স্পোর্টস নিউজ সন্ধান করতেন। ফলাফল স্বরূপ তারা স্ট্যানফোর্ড ফ্যান্টাসি বাস্কেটবল লীগ জিতেও নেন।

আপনি হয়তো ভাবছেন: "সবই তো বুঝলাম কিন্তু এর সাথে সার্চের কি সম্পর্ক?" সম্পর্ক আছে। এভাবে ঘেঁটে ঘেঁটে তথ্য বার করতে গিয়ে জেরি আর ডেভিড বুঝতে পেরেছিলেন ইন্টারনেটে কোন নির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে বের করা কতোটা কষ্টসাধ্য। আর তাই তারা এজন্য কোন সহায়ক ওয়েবসাইটের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। আর এভাবেই ইয়াহুর যাত্রাটা শুরু হয়। কিন্তু তখনকার ইয়াহুর সাথে আজকের আধুনিক সার্চ সিস্টেমের কোন মিল ছিলো না। তখনকার ইয়াহু ছিলো বিভিন্ন ক্যাটাগরি আর সাব-ক্যাটাগরিতে বিভক্ত যাতে মাত্র দুইজন মানুষ মিলে দিনের পর দিন ধরে অসংখ্য ওয়েবসাইটকে নিজের হাতে তালিকাবদ্ধ করেছেন। একদিনে যতোগুলো ওয়েবসাইট তালিকাবদ্ধ করা সম্ভব করতেন। এ কাজটা শুনলে যতোটা সোজা মনে হয় আসলে ছিলো তার চাইতে অনেক অনেক কঠিন ও ক্লান্তিদায়ক। কারন হাজার হোক তারা তো মানুষ, কতো ধকলই বা সইবেন তারা! ধীরে ধীরে ইয়াহু ব্যাপক

জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো ওয়েব ব্যবহারকারীদের মধ্যে। একদম প্রথমে ইয়াহুর নাম কিন্তু ইয়াহু ছিলো না। এর নাম ছিলো - "Jerry's Guide to the World Wide Web"। পরবর্তীতে একটু চটকদার নাম রাখার উদ্দেশ্যে "ইয়াহু (Yahoo)" নামটি নির্বাচন করা হয়। সাইটে দৈনিক ভিসিটের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিলো হু হু করে। ইয়াহুর আইডিয়া ছিলো একটি অসাধারণ আইডিয়া এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র একটি ভালো আইডিয়ার বলে কোন ভালো কোম্পানী গড়ে ওঠে না, এ জন্য প্রয়োজন হয় টাকার.....অনেক অনেক টাকার। কিন্তু যেমনটা সবাই জানে, সিলিকন ভ্যালিতে টাকার কোন অভাব নেই। আর অভাব নেই ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদের। এরা সেই ব্যাক্তি যাদের দ্বারানির্ধারিত হয় কোন স্টার্টআপটি টিকে থাকবে আর কোনটি থাকবে না। এই ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টদেরই বিখ্যাত একজন মাইকেল মরিজ (Michael Motitz) ইয়াহু!তে সর্বপ্রথম বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মরিজ নিজেও ইয়াহুর সাফল্য নিয়ে সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু সর্বোপরি ইয়াহুর চমকপ্রদক আইডিয়াটিই নিঃসন্দেহে তাকে এই সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। কেননা মরিজ জানতেন যে, ইয়াহু হচ্ছে এমন একটি সেবা যা মানুষকে সেসব তথ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করছে যা অন্যথা খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব এবং একরকম নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করছে। এমন একটি জিনিষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মরিজ প্রাথমিকভাবে ইয়াহুর পেছনে ২ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেন। তাতে করে ইয়াহুর টাকা নিয়ে চিন্তাটা সাময়িকভাবে দূর হলেও জেরি ও ডেভিড জানতেন যে সমস্যার মাত্র শুরু হয়েছে। কারন এতো এতো ব্যবহারকারী আর জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও ইয়াহুর নিজের কোন আয় ছিলোনা। কিভাবে ইয়াহু থেকে কিভাবে টাকা আয় করা যায় সে বুদ্ধিও কারো জানা ছিলো না। আসলে শুধু ইয়াহু না, সেই সময়ে কারোরই জানা ছিলোনা ইন্টারনেটে টাকা আয় করার কোন কৌশল।

অবশেষে এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় একটি মাত্র শব্দে, আর তা হলো- "বিজ্ঞাপণ"। আসলে পৃথিবীর আর সবগুলো তথ্য প্রচার মাধ্যমের মতোই ইন্টারনেটও বিজ্ঞাপণের জন্য ব্যবহৃত হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? যখন অনেক সংখ্যক লোক একই জায়গায় জড়ো হয় সেখানে একটি বিজ্ঞাপণের ক্ষেত্র তৈরি হয়, এর চাইতে বেশি মাথা খাটাবার প্রয়োজন বিজ্ঞাপণওয়ালাদের ছিলো না। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। এই বিজ্ঞাপণের ইস্যুতে পুরো ওয়েব কমিনিউটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। একদিকে ছিলো ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট আর ব্যবসায়ীরা যারা ওয়েব থেকে উপার্জনে বিজ্ঞাপণের কোন বিকল্প নেই বলে বিশ্বাস করতেন। আর এক দিকে ছিলেঅ ওয়েবের বিশুদ্ধবাদী বা মৌলবাদীরা যারা বিশ্বাস করতেন এভাবে ইন্টারনেটকে বিজ্ঞাপণের প্রচারণায় ব্যবহার করা হলে ইন্টারনেট তার নিজস্বতা ও বিশুদ্ধতা হারাবে। আসলে বিজ্ঞপণ দেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে জেরি আর ডেভিডরা নিজেরাও শঙ্কিত ছিলেন। তারা ভেবেছিলেন এভাবে বিজ্ঞাপণ দেয়ার ফলে তাদের সাইট ব্যবহারকারীরা রুষ্ট হবেন এবং তারা বিদ্রোহ করবে। আর তাই এক অদ্ভূত উভয় সংকটে পড়েন ইয়াহুর তরুন উদ্ভাবকদ্বয়। কিন্তু ইয়াহুর আর কিইবা করার ছিলো? সাইট চালাতে হলে যে টাকার প্রয়োজন তা একমাত্র বিজ্ঞাপণের মাধ্যমেই আয় করা সম্ভব। ১৯৯৫ এর শেষের দিকে ইয়াহু প্রথমবারের মতো বতাদের সাইটে ব্যানার এ্যাড (Banner Ad) দেয়া শুরু করে। ইয়াহু কর্তৃপক্ষের সব আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করে বিজ্ঞাপণ দেয়ার পরও তাদের ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমার বদলে বেড়েই যেতে থাকে।

ইন্টারনেটের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইয়াহু প্রমাণ করে দেখালো যে ইন্টারনেট থেকেও টাকা আয় করা সম্ভব। এই যুগান্তকারী ঘটনার ফলাফল যা হবার তাই হলো। ওয়েব বাণিজ্যিকরণের যুগ শুরু হলো। ১৯৯৫ সাল নাগাদ ইয়াহুর প্রতিদ্বন্দীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। আসলো ইনফোসিক (Infoseek) , আলটাভিসতা (AltaVista) , লাইকোস (Lycos) মতো সার্চ প্রোভাইডার। কিন্তু সম্ভবত ইয়াহুর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দী ছিলো এক্সাইট (Excite) নামের একটি কোম্পানী। ইয়াহুর মতোই এক্সাইটও ছিলো কিছু স্ট্যানফোর্ড পড়ুয়া ছাত্রদের উদ্ভাবন। কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে সার্চ টেকনোলজি নিয়ে তবে বলতেই হবে যে এক্সাইট এদিক দিয়ে ইয়াহুর চাইতে অনেক অনেক উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করছিলো। ইয়াহুর মতো মানব সহায়তায় অসংখ্য ওয়েবসাইট তালিকাভুক্ত ও ক্যাটাগরি/সাবক্যাটাগরিতে বিভক্তকরণের বদলে এক্সাইট যা লিখে সার্চ দেয়া হয়েছে তা যে যে ওয়েবপেইজে আছে তা খুঁজে বের করতো। আরেক কথায় এক্সাইট ছিলো একটি পুরোমাত্রার সফটওয়্যার। আজ আমরা সার্চ বলতে যা বুঝি তার শুরুটা হয়েছিলো এভাবেই। ১৯৯৭ সাল নাগাদ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এতোই বেড়ে গেলো যে ইয়াহু ও এক্সাইটের মতো সাইটগুলো এক অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে নতুন নতুন ফিচার যোগ করছিলো। কেউ পার্সোনালাইজেশন ফিচার দেয়তো কেউ মেইল সার্ভিস দেয়। সার্চ ওয়েবসাইটগুলো দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো যাতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সকল চাহিদা তারা একটি সাইটেই পূরণ করতে পারে। কিন্তু এতো চাহিদা মিটাতে গিয়ে সাইটগুলো সার্চের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং বেমালুম ভুলেই যায় যে এই সার্চের বদৌলতেই একসময় তাদের উত্থান ঘটেছিলো।

সোজাসুজি বলতে গেলে, জাঁকজমক আর চাকচিক্যের জোয়ারে গা ভাসানো ইয়াহু আর এক্সাইটের মতো সাইটগুলো সেখানেই তাদের সার্চ সিস্টেমকে কবরচাপা দিয়েছিলো। বেশিরভাগ সময়ই সার্চ রেজাল্টগুলোতে থাকা লিংকগুলো ব্যবহারকারীদেরকে নিয়ে যেতো কোন বিজ্ঞাপনী ওয়েবসাইটে। আর তাই সদা সম্প্রসারণশীল ইন্টারনেট ভুবনে কোন তথ্যের নিশ্চিৎ অবস্থান খুঁজে বের করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে বেড়েই চলেছিলো

*ল্যারি পেইজ*

*সের্গেই ব্রিন*

আর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দ্যোগটা এলো বরাবরের মতোই স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির দুই ছাত্রের কাছ থেকেই - ল্যারি পেইজ (Larry Page) ও সের্গেই ব্রিন (Sergey Brin) । এবং আবারো প্রতিষ্ঠানের সামটা ছিলো সংক্ষিপ্ত ও চটকদার - গুগোল (Google)। গুগোল শব্দটির অর্থ হচ্ছে ১০^১০০। অর্থাৎ ১০ এর ১০০তম ঘাততে গাণিতিক ভাষায় সংক্ষেপে গুগোল বলা হয়। ল্যারি পেইজ ও সের্গেই ব্রিন এর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৯৬ সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি আয়োজিত ভবিষ্যৎ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য সান ফান্সিসকোর এক ভ্রমণ ক্যাম্পে। সেই ভ্রমণ ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন ল্যারি পেইজ যিনি অতি শীঘ্রই স্ট্যানফোর্ড থেকে তার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করতে যাচ্ছিলেন। মজার ব্যাপার হলো পেইজের শখ ছিলো লেগো থেকে ইন্কজেট প্রিন্টার বানানো। এই ল্যারি পেইজের নীতির উপর ভর করেই আজকের গুগোলের উত্থান ঘটেছিলো।

এখন প্রশ্ন জাগতেই পারে, কি এমন বিশেষত্ব ছিলো এই নতুন সার্চ ইঞ্জিন গুগোলে যা একে আলাদা করেছিলো আর ১০টা সার্চ ইঞ্জিন থেকে? সোজা কথায় বলতে গেলে গুগোল কোন ওয়েবপেইজ বা ওয়েবসাইটের গুরুত্ব নির্ধারণে এক সম্পূর্ণ নতুন কিন্তু বেশ সরল একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলো। এই নীতি অনুযায়ী, যদি কোন ওয়েবপেইজে আরেকটি ওয়েবপেইজের লিংক উল্লেখিত থাকে এবং কোন ব্যবহারকারী যদি ঐ লিংক অনুসরণ করে উক্ত ওয়েবপেইজে যান তবে তা এক ধরনের রেকোমেন্ডেশন হিসেবে কাজ করে। এক্ষত্রে দ্বিতীয় ওয়েবপেইজের জন্য প্রথম ওয়েবপেইজের রেকোমেন্ডেশনকে একটি ভোট হিসেবে গণ্য হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ধরুন আব্রাহাম লিংকন সম্বন্ধীয় একটি ওয়েবসাইট এরকম ১৫ মিলিয়ন ভোট পেয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ধরেই নেয়া যেতে পারে উক্ত ওয়েবসাইটটিকে অনেকের কাছেই দরকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। আরেকটি ওয়েবসাইট ধরুন যা এরূপ ১৫টি ভোট পেয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই খুব বেশি মানুষের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়নি। ওয়েবপেইজের গুরুত্ব নির্ধারণে গুগোলের এই অনবদ্য "লিংক-গণণা" নীতিই আজকের গুগোলের সাফল্যের মূলমন্ত্র। ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপণের ক্ষেত্রে গুগোল এনেছে

যুগান্তকারী পরিবর্তন। প্রতিবার গুগোলের সার্চ বক্সে আপনি যা লিখে সার্চ দিচ্ছেন তা আপনার মনের একটি অংশের তথা আপনার চিন্তা ভাবনার একটি ক্ষুদ্র অংশ তুলে ধরছে। গুগোল বিজ্ঞাপণের ক্ষেত্রে এই অভূতপূর্ব নীতি অবলম্বন করলো। তারা বুঝতে পেরেছিলো কোন ইন্টারনেট ব্যবহারকরীই অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপণ দেখতে চান না। আর তাই গুগোল শুধু সেই বিজ্ঞাপণই দেয় যা আপনার সার্চ টার্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ব্যাপারটা অনেকটা এমনভাবে চিন্তা করা যেতে পারে: আপনি যদি "Linkin Park" লিখে সার্চ দেন তার থেকে দু'টো জিনিস প্রতীয়মান হয়-

১. আপনি Linkin Park এর ব্যাপারে জানতে আগ্রহী
২. আপনি হয়তোবা Linkin Park এর নতুন এ্যালবামটি অনলাইনে ক্রয় করতেও আগ্রহী।

ঠিক এই নীতিটিই গুগোল তাদের বিজ্ঞপণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধরে নিতেই পারি যে, প্রতিবার আপনি যখন "Car" লিখে গুগোলে সার্চ দেন BMW বা Ferrari এর মতো কোম্পানী অবশ্যই চাইবে সেখানে তাদের একটি বিজ্ঞাপণ থাকুক এবং সেজন্য তারা টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপণও দেবে। অবাঞ্ছিত বিজ্ঞাপণ থেকে ব্যবহারকারীদেরকে মুক্তি দিতে এর চাইতে ব্রিলিয়ান্ট কোন আইডিয়া আদৌ সম্ভব ছিলো কি? হয়তো না।

তবে আপনি যদি ভেবে থাকেন যে এমন একটি সম্ভাবনাময় কোম্পানীর শুরুতেই বিনিয়োগকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তবে আপনি ভুল ভাববেন। প্রকৃতপক্ষে এমন একটা সময় গুগোলের গিয়েছে যখন সিলিকন ভ্যালির প্রতিটি সার্চ প্রোভাইডারের দ্বারে দ্বারে তারা তাদের এই অনন্য আইডিয়ার পরীক্ষামূলক সংস্করণ নিয়ে গিয়েছে কিন্তু কেউ কোন সারা দেয়নি। এমনকি এক্সাইটের মতো কোম্পানী গুগোলের পুরো আইডিয়া মাত্র ১ মিলিয়ন ডলানে কিনে নেবার সুযোগ পেয়েও কেনেনি, কারন তারা গুগোলের কোন ভবিষ্যৎ দেখেনি। আজ গুগোলের মূল্য আন্দাজ করাও কষ্টকর তবে ১০০ বিলিয়ন ডলারের উপরে সন্দেহ নেই কোন। মার্কেটে মেয়ার উন্মুক্ত করার ৩ বছরের মাথায় গুগোলের শেয়ারমূল্য ছাড়িয়ে যায় Macdonalds, Fedex, Intel, Coke, Walmart, IBM এর মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। ১০০ ডলার

থেকে শুরু হওয়া শেয়ারগুলোর বর্তমান মূল্য ৭০০ ডলার।

এতো সাফল্য, এতো জনপ্রিয়তা। সবসময়ই যোগ হচ্ছে ইউটিউব, গুগোল আর্থ, গুগোল ম্যাপস, পিকাসার মতো অনন্য সব সেবা।

সেবার পাশাপাশি গুগোলের প্রতিদ্বন্দী আর শত্রুদু'টোর তালিকায় রোজ বড় হচ্ছে। এ তালিকায় সবার উপরে নাম থাকবে অবশ্যই মাইক্রোসফটের। ইতিহাস সাক্ষী আছে, মাইক্রোসফট বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে অভ্যস্ত। সবার পরে এসেও বাজিমাত মাইক্রোসফট ইতিপূর্বেও করেছে। এখনো তারা সেই চেষ্টা করবে সন্দেহ নেই। গুগোলের অনানুষ্ঠানিক মূলমন্ত্র হলো: "Don't be evil"। গুগোল আজ পর্যন্ত এই নীতি সুষ্ঠুভাবে পালন করে এসেছে। এই নীতি ভবিষ্যতেও তাদের কাজে লাগবে সন্দেহ নেই কোন।

<u>পরিশেষ:</u>

* ব্রিন ও পেইজ বর্তমানে পৃথিবীর শীর্ষ ৩০ ধনীদের দু'জন।

* একটি ভারতীয় মোবাইল ফোন কোম্পানীর Moto হচ্ছে: "An idea can change your life"। কথাটি ইয়াহু ও গুগোলের জন্য অবশ্যই প্রযোজ্য।

** ডিসকভারি চ্যানেলে প্রচারিত Download - The True History of Internet অনুষ্ঠান অবলম্বনে রচিত।*

কৃতজ্ঞতা:

এই পোস্টের কিছু ছবি ও সকল বহির্গামী লিংক উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত

## ইন্টারনেট ব্যবসা - ডট কম বাবল (মূল লেখাটি এখানে):

যদি আপনাকে খুঁজতে বলা হয় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিতে যুগান্তকারী কোন আবিষ্কার যার এখনো উন্মোচন হয়নি, আপনি প্রথমেই কোথায় খোঁজ করবেন? আপনি কোথায় খুঁজবেন তা আমি জানি না, তবে আমার পরামর্শ থাকবে সবার আগে কোন গ্যারেজে খুঁজুন! শুনতে একটু কেমন কেমন লাগছে? তাহলে বলে রাখি, তথ্যপ্রযুক্তির ইতিহাসে অসংখ্য বৈপ্লবিক আবিষ্কারের আঁতুরঘর ছিলো গ্যারেজ - এমনকি HP আর Apple এর মতো প্রতিষ্ঠানেরও, এ তালিকা শেষ হবার নয়। আজ আলোচনার শুরুটা যে প্রতিষ্ঠনটিকে দিয়ে তার জন্মস্থানও কিন্তু এই গ্যারেজ - Amazon.com। এই গ্যারেজটির অবস্থান ছিলো যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে আর এর মালিক ছিলেন জেফ বেজাস (Jeffrey Bezos)।

*জেফ বেজাস*

বেজাসের কর্মজীবনের জীবনের শুরুটা ওয়াল স্ট্রিটে (Wall Street)। উনি ছিলেন যাকে এক কথায় বলা যেতে পারে সারাদিন হিসেবের মধ্যে ডুবে থাকা মানুষ। যখন ইন্টারনেটের আগমণ ঘটলো তখন থেকেই তিনি চিন্তা করতে থাকলেন কি ধরনের পণ্য ইন্টারনেটে বিক্রি করা যেতে পারে। এ জন্য তিনি তালিকার পর তালিকা বানিয়েছিলেন, আর সবসময়ই সেসব তালিকায় সবার ওপরে স্থান পেতো "বই"। এর প্রধান কারন হলো একটা জেফ সেই সময়ই বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবীতে কোটি কোটি বই আছে আর এই সব বইকে বা তার কোন ক্ষুদ্র অংশকেও একত্রিত করা পৃথিবীর কোন লাইব্রেরীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এই কঠিন কাজটাই সম্ভব ছিলো ইন্টারনেটে। জেফ বেজাস ১৯৯৫ সালে Amazon.com নামক সাইট উন্মুক্ত

করেন। স্বভাবতই প্রথম থেকেই Amazon.com এ প্রাধান্য পেতো বই।

*পিয়েরে অমিডিয়ার*

ঠিক সেই সময়কারই কথা - যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালিতে পিয়েরে অমিডিয়ার (Pierre Omidyar) নামে একজন তরুণ সফটওয়্যার প্রোগ্রামারও ইন্টারনেটে ব্যবসার কথা চিন্তা করেছিলেন। আজ পিয়েরে অমিডিয়ার একজন সফল ও অত্যন্ত ধনী একজন মানুষ। কিন্তু সেই ৯০' এর দশকে অমিডিয়ার ছিলেন Apple Computer এ কর্মরত একজন নগন্য সফটওয়্যার প্রোগ্রামার মাত্র। কিন্তু অমিডিয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর তার সেই স্বপ্নই রূপ লাভ করেছে আজকের eBay.com তে। শুরুতে পিয়েরে অমিডিয়ার আর জেফ বেজাসের চিন্তাধারায় একটা মিল ছিলো - দু'জনেই ওয়েবকে কল্পনা করেছিলেন ব্যবসা করার স্থান হিসেবে। কিন্তু এই একটি বিষয় বাদে আর কোন মিল তাদের মধ্যে ছিলোনা। বেজাস যেখানে যুক্তির্নিভর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের বলে Amazon.com কে গড়ে তুলতে চাইছিলেন, সেখানে পিয়েরে অমিডিয়ার এর কোন নির্দিষ্ট ব্যবসা নীতি বা পরিকল্পনা ছিলো না। অমিডিয়ারের কাছে অনলাইন নিলাম সাইটের আইডিয়াটা বেশ ভালো বলে মনে হয়েছিলো আর এই ভালো

লাগাটাই তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। এই আইডিয়া বাস্তবায়নে অমিডিয়ারের খুব একটা ব্যবসায়িক বুদ্ধির প্রয়োজন পড়েনি। শুধুমাত্র নিজের বাসার কম্পিউটারে বসে, কোডিং আর প্রোগামিংয়ের বলেই তার পক্ষে সবকিছু সামলানো সম্ভব ছিলো।

অমিডিয়ার ভেবেছিলেন ইন্টারনেটে EBay এর মতো অনলাইন নিলাম সাইট হবে ছোট, বড় সকল ভোক্তা আর ক্রেতার জন্য একটি "লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (Level Playing Field)। এর মাধ্যমে ছোট ক্রেতারাও সুযোগ পাবে রাঘব বোয়ালদের সাথে প্রতিযোগিতা করার। আর তাই অমিডিয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন EBayকে ইন্টারনেটে উন্মুক্ত করবার। ১৯৯৫ সালের এক ছুটির সপ্তাহে অমিডিয়ার EBayকে জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করেন। একজন-দু'জন করে ব্যবহারকারী সাইটে আসতে শুরু করলো। কিন্তু এসে তারা সাইটে বিক্রির তালিকায় যেসব জিনিস দেখতে পেলো শুনলে আপনার হাসি পাবে। কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি:

* পুরনো কি-বোর্ড আর মাউস
* অটোগ্রাফ সম্বলিত সেলেব্রিটি আন্ডারওয়্যার
* বাচ্চাদের খেলনা দমকলের গাড়ি
* সুপারহিরো লাঞ্চবক্স

উপরের তালিকাটি দেখে কি মনে হচ্ছে? কোন যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক ব্যাবসায়িক উদ্দ্যোগের শুরু নাকি কিছু সেকেন্ডহ্যান্ড আবর্জনার স্তুপ? যদি আপনি পরেরটা বলেন তবে আমি বলবো, হয়তো এ কারনেই আপনি কোন কোটিপতি নন, যেমনটা হচ্ছেন পিয়েরে অমিডিয়ার।

শুরুটা নড়বড়ে হলেও Amazon আর EBay এর সাফল্যের মুখ দেখতে খুব বেশি সময় লাগেনি। EBay খোলার কয়েক মাসের মধ্যেই পিয়েরে অমিডিয়ার হাজার হাজার ডলার আয় করতে শুরু করেন। আর খোলার ৩০ দিনের মধ্যেই Amazon তাদের সেবা সম্প্রসারন করে বিশ্বের ৪৫টি দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে বই সরবরাহ করা শুরু করে। কিন্তু Amazon আর EBay এর এই তাৎক্ষণিক সাফল্য ওয়াল স্ট্রিটের নজর এড়ায়নি। ওয়াল স্ট্রিটের বিশেষজ্ঞ আর পরিসংখ্যানবিদরা ভেবে কূল করতে পারছিলেন না ওয়েব কত দ্রুত

সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো ওয়েবের এই দ্রুত সম্প্রসারনের রহস্যটা কি? এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে সামান্য টেকনোলজিক্যাল জ্ঞান আহরণ করতে হবে, জানতে হবে দু'টি সূত্র সম্পর্কে আর সেই সূত্রদ্বয়র মিলিত প্রভাব সম্পর্কে।

১ম সূত্রটি হচ্ছে বিখ্যাত সিলিকন চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেলের প্রতিষ্ঠাতা গর্ডন মুরের (Gordon E. Moore) যা মুরের সূত্র (Moore's law) নামেও পরিচিত। সূত্রটা হলো অনেকটা এমন - "ইন্ট্রিগ্রেটেড সার্কিটের (তা মাইক্রোপ্রসেসরই হোক আর মেমোরি চিপ) গতি ও ক্ষমতা প্রতি ১৮ মাসে দ্বিগুণ হয়।" সূত্রটা শুনে আপনার মনে হতে পারে - "তো কি হয়েছে?" দ্বিগুণ হবার মাহত্মটা হলো খুব ছোট কোন মান থেকে বড় কোন মানে পৌঁছাতে যদি এই দ্বিগুণ নীতি অবলম্বন করা হয়, তাহলে অবাক হয়ে দেখবেন যে খুব বেশি ধাপের প্রয়োজন পড়ছে না। যেমন: ২ --> ৪ এ যেতে ১টি ধাপ লাগছে। ২ থেকে ৮ এ যেতে (২ --> ৪ --> ৮) ২টি ধাপের প্রয়োজন পড়ছে। এভাবে মাত্র ২০ তম ধাপে আপনি ২০ লাখে পৌঁছে যাবেন। এই সূত্রের ফলাফল? ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ট্রানজিস্টরের আবির্ভাব আর পূর্বে রুম জুড়ে অবস্থান করা কম্পিউটারকে কোলের ওপর বসানোর মতো অভিজ্ঞতা।

২য় সূত্রটি হচ্ছে ইথারনেটের জনক রবার্ট মেটক্ল্যাফের সূত্র যা মেটক্ল্যাফের সূত্র নামে পরিচিত। এই সূত্রকে সরল করে বলা যেতে পারে - "যখন কোন নেটওয়ার্কে একজন নতুন ইউসার যোগ দেন, তিনি শুধু ঐ নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীর সংখ্যা একজন বাড়িয়েই (+১) দেন না, বরং ঐ নেটওয়ার্কের কার্যকারিতাও বাড়িয়ে দেন।" সেটা কিভাবে? মনে করি কোন নেটওয়ার্কে ২ জন ব্যবহারকারী আছেন। তাহলে উক্ত নেটওয়ার্কে সম্ভাব্য সংযোগের সংখ্যা মাত্র ১টি।

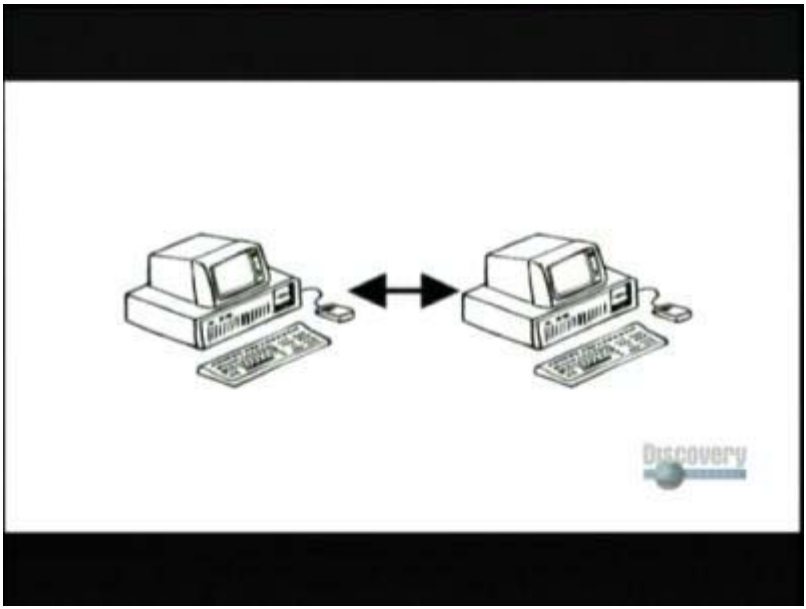


যখন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩ জন, তখন সম্ভাব্য সংযোগের সংখ্যা ৩টি।

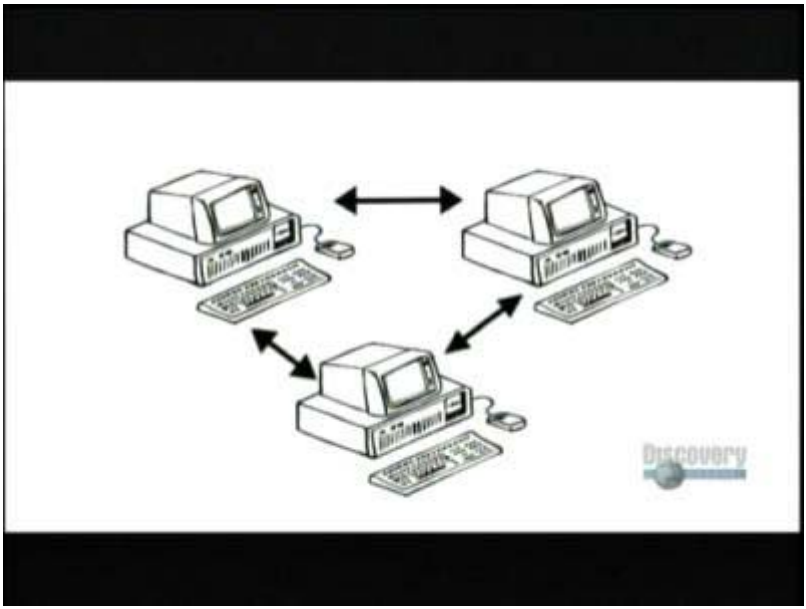


যখন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪ জন, তখন সম্ভাব্য সংযোগের সংখ্যা ৬টি।

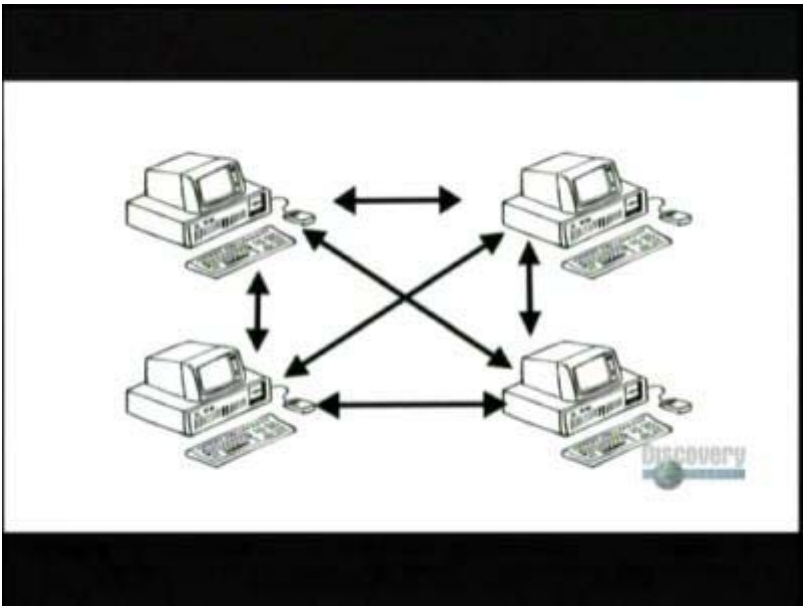


এবারে সংখ্যাটা একটু বাড়াই। যখন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ জন তখন সম্ভাব্য সংযোগের সংখ্যা ৪৫টি।

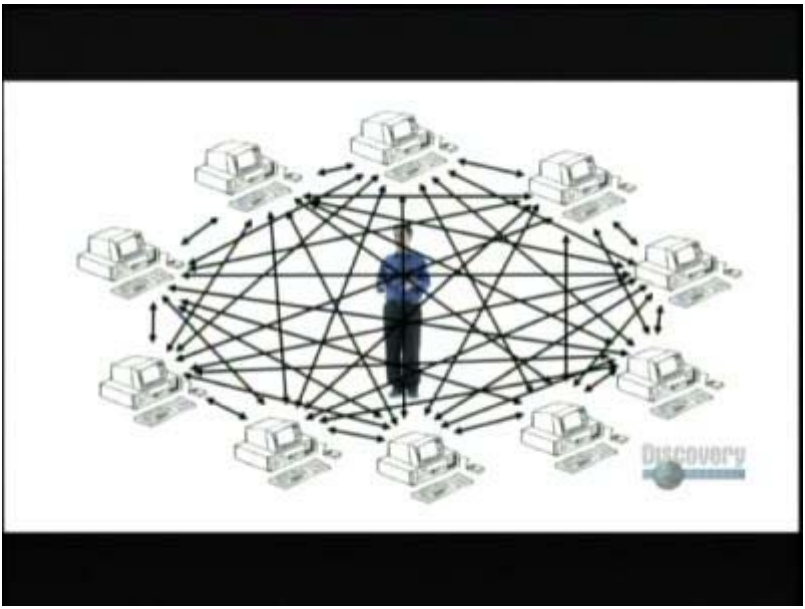


এবং যখন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০, তখন সম্ভাব্য সংযোগের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের মতো। আর তাই এই সূত্র ধরে ইন্টারনেটের ব্যাপারে বলা যায় যে যতো সময় যাচ্ছে ইন্টারনেট আরো কার্যকারী হয়ে উঠছে। কেননা সময়ের সাথে সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে যোগাযোগ আর পক্ষান্তরে বাড়ছে ইন্টারনেটের কার্যকারিতা এবং যারা এখনো ইন্টারনেটে যোগ দেননি তাদের কাছে একে আরো আকর্ষণীয় করে তুলছে।

৯০' এর দশকের মাঝামাঝি এসে মুর আর মেটক্ল্যাফের সূত্র বলতে গেলে হাতে হাত রেখে কাজ করে যাচ্ছিলো। আধুনিক আর শক্তিশালী পিসির উদ্ভব ঘটছিলো, বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক কেবল সংযোগ টানা হয়, বাড়ছিলো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা, ইন্টারনেট এসে পড়ছিলো মানুষের হাতের মুঠোয়। ওয়াল স্ট্রিট ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো ইন্টারনেটের এই জনপ্রিয়তা আর কার্যকারিতার কথা। আর এর অর্থ ছিলো একটাই। শীঘ্রই ইন্টারনেট পরিণত হয় নতুন একটি ব্যবসাক্ষেত্রে।

ইতিহাস আমাদেরকে বলে, যখনই পৃথিবীর কোথাও কোন নতুন কোন ব্যবসা ক্ষেত্র তৈরি

হয়েছে, তখনই হিরিক পড়ে গিয়েছে কোম্পানীর পর কোম্পানী খোলার, আর ব্যবসাকে নিজের আয়ত্বে আনার প্রচেষ্টার। এর ভালো উদাহরণ হতে পারে মধ্য ১৮শ শতাব্দীর যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্তরাজ্যে রেলওয়ে ব্যবসার সূচনা বা ঐ একই সময়েরই আরেকটি যুগান্তকারী প্রযুক্তি টেলিগ্রাফের আবিষ্কার অথবা তারও ৫০ বছর পরের মোটোরগাড়ির আবিষ্কার। প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই গল্পটা প্রায় এক। শুরুটা কোন যুগান্তকারী আবিষ্কার দিয়ে, তারপর কিছু উদ্যোগী মানুষের সাহসী সূচনা আর অতঃপর বিনিয়োগকারীদের মেলা জমে যাওয়া আর কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালা। কিন্তু পরিণতি প্রকি ক্ষেত্রে একটাই - কর্মী ছাঁটাই, অসংখ্য কোম্পানীর দেউলিয়া হয়ে যাওয়া আর কোটি কোটি টাকার লোকসান।

ইন্টারনেটে ইতিহাসটাও অনেকটা এমনই। শুরুটা নেটস্কেপের যুগান্তকারী আবিষ্কার নেটস্কেপ ন্যাভিগেটরের ব্রাউসারের শেয়ার মার্কেটে উন্মুক্তকরণ, তারপরে শেয়ার ছাড়ে ইয়াহু! আর এক্সাইটের মতো সার্চ কোম্পানীরা। আর তারও প্রায় এক বছর পরে ১৯৯৭ সালের মে মাসে শেয়ার ছাড়ে Amazon। Amazon এর বয়স তখন মাত্র ২ বছর, ছিলো কিছু বিশ্বস্ত বিনিয়োগকারী, কিন্তু ছিলো না কোন লাভ। কিন্তু জেফ বেজাস Amazonকে সবার কাছে পৃথিবীর বৃহত্তম বইয়ের দোকান বলে বেড়াচ্ছিলেন আর তাই বিনিয়োগকারীর অভাব হচ্ছিলো না। যদিও বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়ছিলো, বাড়ছিলো বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ, কিন্তু ব্যবসায় লাভ করা বলতে যা বোঝায় তা Amazon মোটেও করছিলো না। বরং বিপুল লোকসান দিয়ে কোম্পানী চলছিলো। এমনকি বেজাস যখনই সুযোগ পাচ্ছিলেন তিনি দাম আরো কমাচ্ছিলেন।

এখন আপনার কাছে মনে হতে পারে - জেফ বেজাস কি তবে পাগল ছিলেন? তবে কি বেজাস লাভের কথা ভাবছিলেন না? এভাবে লোকসান দিয়ে দিয়ে কোম্পানী চালু রাখার কি মানে? বিনিয়োগকারীরাই বা কি বুঝে Amazon এর পিছনে অর্থ ব্যয় করছিলেন। আসলে বেজাস একটি সুনির্দিষ্ট নীতির বলে Amazonকে পরিচালনা করছিলেন, আর তা হলো - "Get big fast (দ্রুত সম্প্রসারন)"। এই নীতিকে কল্পনা করো যেতে পারে আমাদের দেশে কতিপয় সংবাদপত্রের ব্যবসার শুরুটার সাথে। এরা প্রথমে সংবাদপত্র ছাপিয়ে খুব অল্প মূল্যে ও লোকসান দিয়ে বিক্রি করে। মূল্য কম হওয়ায় ক্রমেই এসব পত্রিকার জনপ্রিয়তা বাড়ে।

একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা ঠিকই সংবাদপত্রের দাম বাড়ায়। কিন্তু প্রাথমিক ঐ জনপ্রিয়তার দরুন মানুষ বেশি মূল্য দিয়ে হলেও উক্ত পত্রিকা কেনে ও পড়ে।

১৯৯৮ সাগাদ EBay বুঝতে পারে যে যদি ওয়াল স্ট্রিট এখনো তাদের কোন ভবিষ্যত দেখছে না এবং কারা প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করে কিভাবে EBayকে আরো লাভজনক করে তোলা যায়, কিভাবে EBay থেকে বিপুল লাভ করা সম্ভব সে ব্যাপারে ওয়াল স্ট্রিটকে আশ্বস্ত করা যায়। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে EBay তাদের শেয়ার উন্মুক্ত করে দেয় ঠিক এমন একটা সময়ে যখন বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাব চলছিলো। আর তাই একটা আশঙ্কা সবার মনে কাজ করছিলো। EBay কি লাভের মুখ দেখবে? কিন্তু সব আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করে EBay প্রচুর লাভজনক সাব্যস্ত হয় ঐ কয়েক মাসের ভেতরই মেয়ার মূল্য প্রায় ৪ গুণ হয়ে যায়। ওদিকে ওয়াল স্ট্রিট Amazon এর ভবিষ্যত উজ্জ্বল তেখতে পাচ্ছিলো। ১৯৯৮ এর শেষের দিকে ওয়াল স্ট্রিট ঘোষণা করে যে প্রচুর লোকসান সত্ত্বেও, আগামী ১ বছরের মধ্যেই Amazon এর শেয়ার মূল্য দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এবং মজার ব্যাপার হলো Amazon এর শেয়ার মূল্য দ্বিগুণ হলোও, কিন্তু ১ বছরে নয়, বরং সাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই।

এই ঘটনাগুলো দারুনভাবে প্রভাবিত করলো মার্কিন শেয়ার বাজার আর জনগণকে। প্রায় কোন সংক্রামক রোগের মতো শুরু হয়ে গেলো শেয়ার কেনার প্রতিযোগিতা। মানুষ যে কোম্পানীর নামের শেষেই .com (.ডট কম) কথাটা খুঁজে পাচ্ছিলো তার শেয়ার কিনছিলো। এমনকি মানুষ দোকানে, রেস্টুরেন্টে, বাড়িতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা টিভিতে ফিনান্সিয়্যাল নিউজ চ্যানেল দেখতো, যাচাই করতো তাদের কেনা শেয়ারের মূল্য বেড়েছে নাকি কমেছে। অদ্ভূত সে নেশা। অনেকে সকালে শেয়ার কিনে বিকেলেই বিক্রি করে দিতো এমন ঘটনাও দেখা গিয়েছে। আর বিনিয়োগকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো, যেকোন ইন্টারনেট ভিত্তিক কোম্পানী দেখলেই তারা কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালার জন্য হামলে পড়ছিলো। আর এই সময়টাকেই ইন্টারনেটের ইতিহাসে অভিহিত করা হয়ে থাকে "ডট কম বাবল (dot com bubble)" হিসেবে। মানুষ এই সময়ে দিবাস্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্ন দেখেছে লাখ লাখ ডলারের মালিক হবার। টাকা যেন আকাশে উড়ছিলো, শুধু হাত বাড়িয়ে ধরার অপেক্ষা।

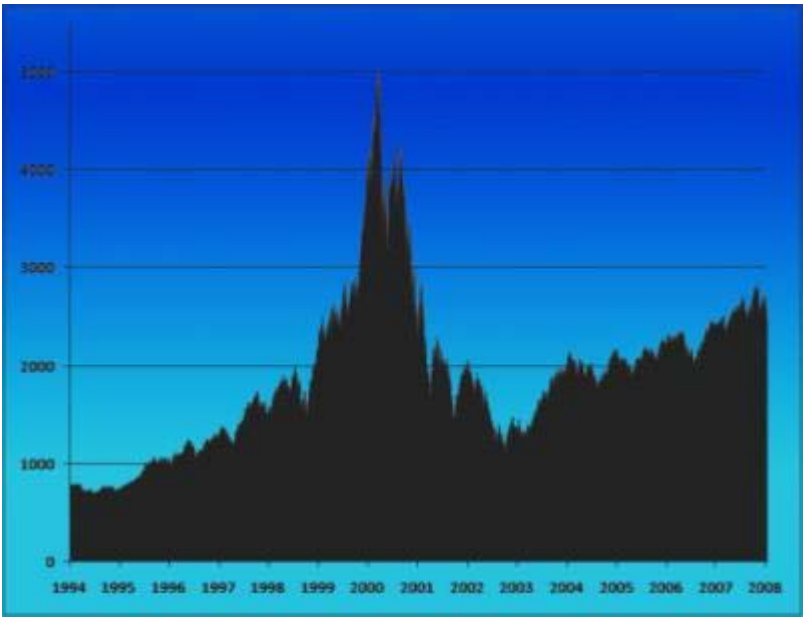


১৯১২ সালের ১৪ই এপ্রিল টাইটানিক আটলান্টিক সাগরের অতলে নিমজ্জিত হয়। তার ঠিক ৮৮ বছর পরে আরেক ১৪ই এপ্রিলে ইন্টারনেট বাণিজ্যের অনেকটা তেমনই পরিণতি ঘটে। এই দিনটি ওয়াল স্ট্রিটে সবসময় পরিচিত হয়ে থাকবে "ব্ল্যাক ফ্রাইডে (Black Friday)" হিসেবে। এইদিন NASDAQ ৩৫৫ পয়েন্ট হ্রাস পায় ও শেয়ারমূল্য প্রায় ২৫% কমে যায়। এই ধস ছিলো মার্কিন স্টক মার্কেটের ইতিহাসে বৃহত্তম ধস। ব্ল্যাক ফ্রাইডের ঐ সপ্তাহে শুধু ছোট কোম্পানীগুলোই নয়, বিপদে পড়ে যায় Amazon, EBay এর মতো বড় কোম্পানীগুলোও। Amazon তো প্রায় দেউলিয়াই হয়ে গিয়েছিলো। ২০০১ সালে Amazon তার ১৩০০ কর্মীকে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়। বিশাল লোকসানের মুখোমুখি হন শেয়ার মালিকরা। ক্ষোভের সুর ওঠে তাদের মাঝে। আর সব ক্ষোভ গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছিলো বিনিয়োগকারী আর ওয়াল স্ট্রিটের ওপর।

কিন্তু ডট কম বাবলের এই সময়কালে অসংখ্য ভবিষ্যৎহীন, গন্তব্যহীন ও অর্থহীন ওয়েব প্রজেক্টের পেছনে অনেক অনেক অর্থ ঢেলেছেন বিনিয়োগকারীরা, গড়ে তুলেছেন তাসের

ঘরের মতো সব প্রতিষ্ঠান। প্রশ্ন উঠতে পারে, বিনিয়োগকারীরা কি তবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? ওয়াল স্ট্রিটেরই বা কি হয়েছিলো? তারা কি বুঝতে পারেনি যে হাওয়ার ওপর গড়ে তোলা এসব কোম্পানীর কোন ভবিষ্যত নেই? তারপরও কেনা তারা মানুষকে মিছে আশা দেখিয়েছিলো। বিনিয়োগকারীরা কিন্তু ঠিকই জানতেন এসব কোম্পানীর অধিকাংশেরই কোন ভবিষ্যত নেই। কিন্তু তারা এও জানতেন যে এসব কোম্পানীর কিছু কিছু ঠিকই টিকে থাকবে, এমনকি ভবিষ্যতে রাজত্ব করবে। আর এই সুযোগটাই তারা নিয়েছিলেন।

তবে পৃথিবীর আর সব খারাপের মতোই এরও কিছু ভালো দিক ছিলো। ডট কম বাবলের হিরিকের কারনে এই সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় সম্প্রসারণ ঘটেছে। ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে ঘিরে ফেলা গিয়েছে ধরিত্রীকে। কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের মতো প্রযুক্তি হয়েছে সহজলভ্য, এসেছে হাতের নাগালে। যা হতে হয়তো ১৫ বছর লাগতো, তা ঘটেছে মাত্র ৫ বছরের ক্ষুদ্র সময়কালে।

** ডিসকভারি চ্যানেলে প্রচারিত Download - The True History of Internet অনুষ্ঠান অবলম্বনে রচিত।*

কৃতজ্ঞতা:

এই পোস্টের কিছু ছবি ও সকল বহির্গামী লিংক উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত

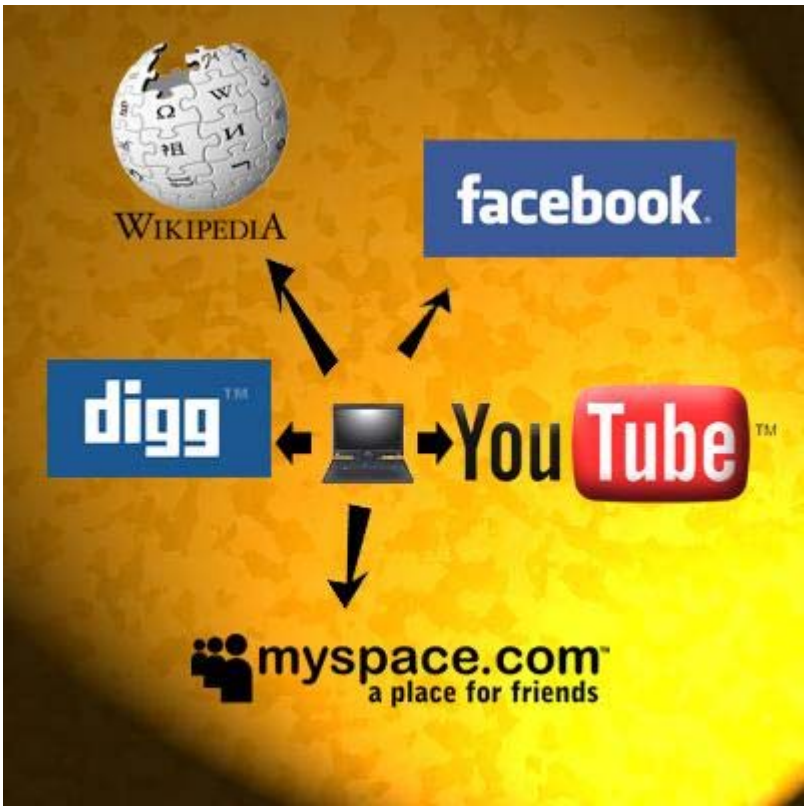


## ওয়েব বিপ্লব: (মূল লেখাটি এখানে):

বলুনতো আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমি, আপনি, আমরা সবাই প্রতিটি মূহুর্ত কিসের আসায় থাকি? কি সেই জিনিস যা আমরা প্রতিনিয়ত খুঁজে ফিরি, যাকে আমরা আর সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেই? একজন আদর্শবাদী হয়তো বলবেন এর জবাব হলো - "প্রেম" অথবা হয়তো "সুখ"। একজন রাজনীতিবীদ হয়তো উত্তরে বলবেন - "ক্ষমতা" বা "টাকা"। কিন্তু আমি উত্তরে বলবো মানব জাতির সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা হলো -

"যোগাযোগ"।

আজ একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এসে যোগাযোগ ব্যবস্থা আর যোগাযোগের ধরন এ সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটছে প্রতি মূহুর্তে। আজ থেকে ২০ বছর আগেও আমাদের সভ্যতা, আচার, ব্যবহার, আমাদের ওঠা-বসা, আমরা কি দেখবো, পড়বো বা শুনবো এসবই পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হতো টেলিভিশন, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র আর মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির বিগ বসদের দ্বারা। শুধু তাই নয়, এই বিগ বসদের হাতেই নির্ধারিত হতো আপনি কতটুকু তথ্য পাবেন, কখন ও কোথায় পাবেন এবং তার জন্য আপনাকে কতো খরচ করতে হবে। কিন্তু আজ ২০০৮ এ এসে এ সব কিছুরই হিসেব পাল্টে গিয়েছে। আর এই হিসেব পাল্টানো নির্নায়কটির নাম হলো - "ইন্টারনেট"। বর্তমান ইন্টারনেট হলো সেই মিডিয়া - "যা কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু গড়ে উঠছে সবার সহায়তায় (Controlled by no one and shaped by everyone)", আরেক কথায় - "আমাদের মিডিয়া"। আজ ইন্টারনেট আমাদের যোগাযোগের পন্থায় আর ধরনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, নিয়ন্ত্রন করছে আমাদের সভ্যতাকে, আমাদের হাঁটা-চলা, ওঠা-বসা সবকিছু। তথ্য-যোগাযোগ আজ আর শুধু কতিপয় ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে মুষ্ঠিবদ্ধ কোন ক্ষমতা নয়, বরং সবার জন্য বিনামূল্যে বিতরণকৃত এক উপযোগিতা।

এখন পর্যন্ত আমরা জেনেছি কিভাবে ইন্টারনেট আমাদের জীবনে পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু আজ আমরা জানবো কিভাবে আমরা মানুষরা, ইন্টারনেটে পরিবর্তন এনেছি। আসুন প্রথমে কয়েক জন মানুষের সাথে পরিচিত হই - চ্যাড হার্লি (Chad Hurley) , জাওয়েদ করিম (Jawed Karim) , স্টিভ চেন (Steve Shih Chen) , কেভিন রোজ (Kevin Rose) , জে. এডেলসন (Jay Adelson) । নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আপনাদের অনেকেই আজ প্রথমবারের এদের নাম শুনছেন। এদের মধ্যে কেভিন রোজ আর জে. এডেলসন হলেন বিখ্যাত সোস্যাল নিউজ ওয়েবসাইট digg এর সহপ্রতিষ্ঠাতা।

*কেভিন রোজ*

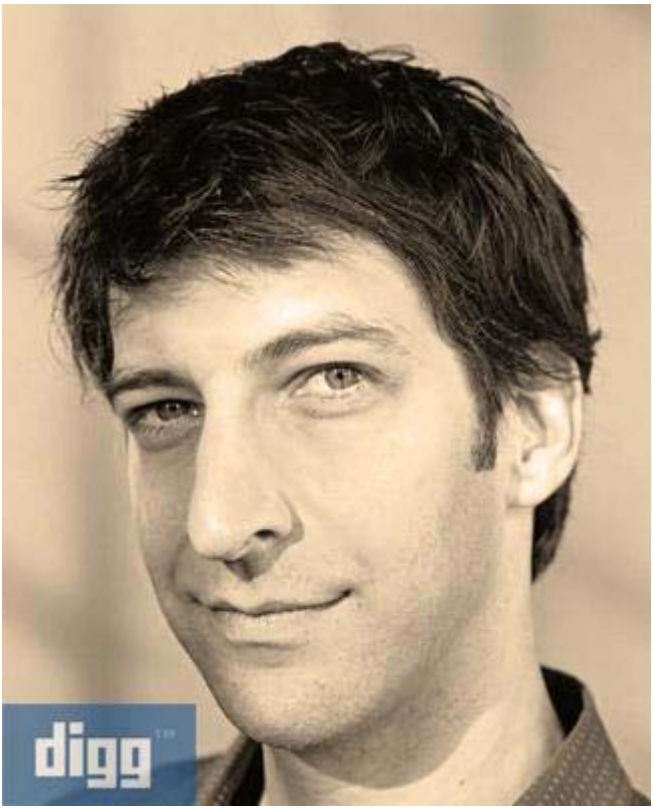


*জে. এডেলসন*

digg এর শীর্ষ খবরগুলো নির্ধারিত হয় digg এর নিবেদিত প্রাণ ভক্তকূল ও পাঠকদের দ্বারা অনেকটা ভোটিং সিস্টেমের মধ্য দিয়ে। আরকে কথায় digg এর পাঠকরাই এর সম্পাদক। অন্যদিকে চ্যাড হার্লি, জাওয়েদ করিম ও স্টিভ চেন হলেন পৃথিবীর তুমুল জনপ্রিয় ওয়েবসাইটগুলোর একটি ইউটিউব (Youtube) এর সহপ্রতিষ্ঠাতা, যা ২০০৬ সালে গুগোল ১.৬৫ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে কিনে নেয়।

*ছবির বাম থেকে ডানে ক্রমানুসারে- চ্যাড হার্লি, স্টিভ চেন ও জাওয়েদ করিম*

Youtube এ পৃথিবীর কোটি মানুষ তাদের নিজস্ব ভিডিও আপলোড করেন ও শেয়ার করেন সাইটটির কোটি কোটি ব্যবহারকারী আর দর্শকদের সাথে। গুগোলের মতো বিচক্ষণ কোম্পানীর ইউটিউবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আঁচ করতে খুব বেশি সময় লাগেনি।

উপরে চ্যাড হার্লি, কেভিন রোজ বা অন্যান্যদের ছবিগুলো দেখে প্রথমেই আপনাকে যে ভাবনাটা ভাবাবে তা হলো এদের বয়স। অত্যন্ত তরুণ বয়সেই অপরিসীম সাফল্যের মুখ দেখেছেন এরা। এদেরকে দেখে আপনার আর দশজন টাকার লোভে শুরু হওয়া স্টার্টআপার তরুণ বলে মনে হতেই পারে, মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে ভাবনাটা শুধু টাকা আয়ের চেয়ে একটু বেশি ভেবেছিলেন বলেই আজ এই অবস্থানে পৌঁছেছেন তারা। আর সেই অতিরিক্ত ভাবনাটা ছিলো তাদের আবিষ্কার দিয়ে আর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইন্টারনেট তথা পুরো পৃথিবীকে পরিবর্তনের ভাবনা। আর এইসব তরুণরাই হচ্ছেন Web 2.0 (ওয়েব টু পয়েন্ট ও) বিপ্লবের কর্ণধার।

Web 2.0 এর মূল কথাটাই হচ্ছে শেয়ারিং - হোক তা কোন ঘটনা বা আপনার জীবনের কোন

মূহুর্ত। Web 2.0 একমুখী ওয়েবকে দ্বিমুখী করেছ - শুধু যে আপনি কোন কিছু নিজেই উপভোগ করে সন্তুষ্ট থাকবেন তাই নয়, অন্য কারো সাথে শেয়ার করে আপনি তাকেও সমান বিনোদিত করার ক্ষমতা পাচ্ছেন। এইতো মাত্র কয়েক বছর আগের কথা। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠানগুলো পূর্ণ ছিলো বহু বছরের পুরাতন ঐতিহ্য আর প্রথায়। কিন্তু এখন আর নয়। Youtube এর মতো সার্ভিস আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে অনলাইনে প্রত্যেকের নিজের ভিডিও চ্যানেল খোলার। আজ আমরা নিজেরাই একেকটি টিভি চ্যানেলের মালিক। বহু বছর ধরে সম্প্রচারের যে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিলো শুধুমাত্র কতিপয় ব্যাক্তির হাতে আজ সেই ক্ষমতা সবার হাতে। একটু আগে যে digg এর কথা বললাম, digg ও অনেকটা Youtube এর মতোই সেবা আমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছে। শুধু digg এর এক্ষেত্রে পার্থক্যটা হলো কন্টেন্ট। Youtube যেখানে ভিডিও সম্প্রচার আর শেয়ার করবার ক্ষমতা দিচ্ছে সেখানে digg দিচ্ছে খবর বা সংবাদ শেয়ার করার ক্ষমতা। তবে কোন সংবাদপত্রের ন্যায় digg এ কোন খবর স্থান করে নেবে কি নেবে না এ সিদ্ধান্তটা নেয় পাঠকরা নিজেরাই। যতো বেশি বার ইন্টারনেটে একটি পেইজকে digg করা হয়, অর্থাৎ কিনা ভোট দেয়া হয়, সে সংবাদটি ততো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ব্যাপারটা এভাবে কল্পনা করা যেতে পারে - digg এর মাধ্যমে একই বিষয়ে New York Times এ প্রকাশিত একটি খবর এবং ইন্টারনেটে কোন ব্লগে প্রকাশিত কোন একটি পোস্ট একই কাতারে চলে আসছে। আর সিদ্ধান্ত পাঠকের হাতেই কোনটাকে তারা বেশি গুরুত্ব দেবেন, বিশ্বাস করবেন।

Youtube আর digg এর মতো সার্ভিসগুলো একটি সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে, আর তা হলো - "জনসমর্থন নীতি"। মানুষ হিসেবে প্রকৃতিগতভাবেই আমরা নিজেদের প্রচার ভালোবাসি, আর এই সুযোগটাই Youtube আর digg কাজে লাগিয়েছে। তবে এই প্রচারের ব্যাপারটা বোধ করি আমাদের পরবর্তী আলোচ্য ব্যাক্তিটির চাইতে ভালো করে কেউ জানেন না - মার্ক জাকারবার্গ (Mark Zuckerberg)।

*মার্ক জাকারবার্গ*

মার্ক জাকারবার্গ হচ্ছেন বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় সোস্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক ফেইসবুকের (Facebook) প্রতিষ্ঠাতা। Web 2.0 এর যুগেও ফেইসবুকের জনপ্রিয়তা প্রায় অবিশ্বাস্য। বর্তমানে Facebook এর ব্যবহারকারী প্রতি সপ্তাহে ৩% করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২ লক্ষ নতুন ব্যবহারকারী Facebook এ যোগ দিচ্ছেন। Facebook এর বাজার মূল্য এখন আন্দাজ লাগানোও কষ্টকর। ২০০৭ সালের অক্টোবরে মাইক্রোসফট (Microsoft) Facebook এর মাত্র ১.৬% শেয়ার কেনে ২৪৬ মিলিয়ন ডলার খরচ করে। আর এটাই বলে দেয় Facebook এর মূল্য এখন কত! Facebook কে অভিহিত করা হয়ে থাকে পরবর্তী গুগোল হিসেবে আর মার্ক জাকারবার্গকে দেখা হয় ভবিষ্যৎ বিল গেটস রূপে। Facebook এর মতোই আরো একটি জনপ্রিয় সোস্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক হচ্ছে মাইস্পেস (Myspace) যার জন্ম ২০০৩ এ। কয়েক বছরের মধ্যেই Myspace তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একটা সময় ছিলো যখন Myspace ভিসিটের দিক দিয়ে গুগোলকেও ছাড়িয়ে যায়। এটাই সম্ভবত Web 2.0 এর সবচেয়ে মজাদার দিক, আজ আপনাকে এমন একটি কোম্পানী বা ব্যাক্তির নাম বলা হলো যার নাম আপনি আগে কোনোদিন শোনেননি, আর পরের দিনই দেখবেন সেই কোম্পানী বা

ব্যাক্তিরই চারিদিকে জয়জয়কার।

কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে কি - Youtube, digg, Facebook বা Myspace এর উত্থানটা কিন্তু পুরোপুরি শূণ্য থেকে নয়। বরং এই কোম্পানীগুলোর উত্থানের পেছনে রয়েছে আরো একটি যুগান্তকারী প্রযুক্তির অবদান যার বয়সও খুব বেশি নয় - এইতো হবে বছর দশেক। আর তারাই অনলাইন শেয়ারিং ধারণার প্রবর্তক। যার কথা এখন বলবো তিনি শুধু প্রোগামারই ছিলেন না, একইসাথে ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী। আমরা বলছি বিখ্যাত অনলাইন মিউজিক ফাইল শেয়ারিং নেটওয়ার্ক ন্যাপস্টার (Napster) আর এর প্রতিষ্ঠাতা শন ফ্যানিং (Shawn Fanning) এর কথা।

*শন ফ্যানিং*

আজ থেকে ১০ বছর আগেও ইন্টারনেট ছিলো অনেকটাই নিরস একটা মিডিয়া। সংবাদপত্র বা টেলিভিশনের মতো আর ১০টা মিডিয়ার থেকে ভিন্ন ছিলো না কোনো দিক দিয়েই। ইন্টারনেটে তখনও মানুষ তখন শুধু তথ্য পেতো যেমনটা সংবাদপত্র বা টেলিভিশন থেকে পেয়ে থাকি আমরা - পার্থক্য শুধু এই যে তথ্যগুলো দেখা যেতো কম্পিউটারের পর্দায়। এমন একটি সময়েই Napster এর আবির্ভাব। তখনকার একজন এ্যামেরিকান সঙ্গীতপ্রেমীর জীবনটা ছিলো অনেকটা এমন। ধরুন আপনার একটা গান রেডিওতে শুনে খুব ভালো লাগলো। আপনি কষ্ট করে দোকানে গিয়ে সেই এ্যালবামের সিডি কিনে আনলেন, যে গানটি

ভালো রেগেছিলো তাও শুনলেন। কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো যখন দেখলেন যে ঐ এ্যালবামের আর একটা গানও ভালো না - অর্থাৎ পুরো টাকাটাই জলে। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অবস্থাটা এমনই ছিলো এবং কারোরই কিছুই করার ছিলো না। Napster প্রথমবারের মতো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদেরকে সুযোগ করে দিয়েছিলো অনলাইনে কোন এ্যালবামের সব গান ডাউনলোড করে শোনবার অথবা পছন্দ মতো গান বেছে নিয়ে শোনবার, আর এর সবই বিনামূল্যে! প্রায় ঐ সময়ই বিখ্যাত কোম্পানী আইবিএম (IBM) একটি বেশ ব্যয়সাপেক্ষ জরিপ চালিয়েছিলো এটা যাচাই করতে যে মানুষ ইন্টারনেট থেকে গান ডাউনলোড করে শুনতে বা সিডিতে বার্ন করার ব্যাপারে কতোটা আগ্রহী। আর এই জরিপের ফলাফল যা এসেছিলো তা ছিলো প্রায় অবিশ্বাস্য! IBM এর জরিপের ফল ছিলো যে মানুষ এমন কোন কিছু করতে মোটেও আগ্রহী নয়। আর এর ফলাফল যা হবার তাই হয়েছিলো - প্রথম থেকেই Napster প্রতি মিউজিক কোম্পানীর কপিরাইট আইন ভঙ্গ করার অভিযোগের আগুনে এই জরিপের ফল যেন তুষ ছড়িয়ে দিলো, ফলস্বরূপ Napster বন্ধ হয়ে গেলো। Napster বন্ধ হয়ে গেলেও পাইরেসি কি বন্ধ হয়েছে? বিট টরেন্ট (BitTorrent) , কাজা (Kazaa) , লাইমওয়্যার (LimeWire) এর মতো ফাইল শেয়ারিং সার্ভিসগুলো Napster এর অসম্পূর্ণ প্রজেক্টকেই যেন পূর্ণতা দিয়েছে এবং তাও ব্যাপক আকারে। Youtube এর মতো ওয়েবসাইটে কপিরাইটেড ভিডিওর ছড়াছড়ি। IBM সেই জরিপের ফল কতোটা হাস্যকর ছিলো তা আমরা বুঝি যখন দেখি বাজার ছেয়ে গিয়েছে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোডকৃত গানের MP3 এ। আর Apple এর মতো প্রতিষ্ঠান iTunes Store এর মতো সার্ভিস থেকে কোটি কোটি ডলার আয় করছে যেখানে প্রতিটি গান শক্ত কপিরাইট নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ ০.৯৯ ডলারে বিক্রি হচ্ছে।

মাইস্পেসের প্রথম দিককার জনপ্রিয়তার পেছনেও কিন্তু ছিলো এই অনলাইন মিউজিক শেয়ারিং সিস্টেম। ২০০৫ এ প্রায় ৫৮০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে নিউজ কর্প (News Corp) গ্রুপ কিনে নেয়। কিন্তু শীঘ্রই Facebook এর জনপ্রিয়তার কাছে Myspace ম্লান হয়ে যায়। Web 2.0 এর যুগে আসলে যুদ্ধটা নতুন আর পুরাতনের মধ্যে নয়, বরং নতুন বনাম নতুন।

আসলে Youtube, digg, Facebook বা Myspace এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের আন্দাজের চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী। আর এই শক্তিটাই স্বাভাবিকভাবে অনেকের

কাছে ভয়ের কারন। ২০০৭ এ Youtube এর বিরুদ্ধে কপিরাইটেড ভিডিও সাইটে দেয়ার অভিযোগ এনে ১ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবী করে মামলা করে বিখ্যাত মিডিয়া প্রতিষ্ঠান ভায়াকম (Viacom)। কিন্তু Napster কে ভূপাতিত করা যতোটা সোজা ছিলো, Youtube এর ক্ষেত্রে তা অতোটা সোজা নয়। কারন Youtube এর মালিক আর কেউ নয়, গুগোলের মতো একটি প্রতিষ্ঠান। একই রকম একটি শঙ্কা আছে উইকিপিডিয়ার (Wikipedia) মতো ওপেন এনসাইক্লোপিডিয়াকে প্রজেক্টকে নিয়েও। এই এনসাইক্লোপিডিয়ার অধিকাংশ তথ্যই এর ব্যবহারকারী আর পাঠকদের দেয়া তথ্য নির্ভর। আর তাই তথ্য বিকৃতির অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। তবে শক্ত মোডারেশনের জন্য কখনোই বেশিদূর যায়নি এই ব্যাপারগুলো। Myspace এর মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্রের ১৩ বছর বয়সী তরুনী মেগান মাইয়ারকে (Megan Meier) আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করে আত্মহত্যায় বাধ্য করানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে।

ইংরেজীতে যে একটা কথা আছে - "With great power comes great responsibility (ক্ষমতা যতো বড় হয়, দায়িত্বও ততো বেড়ে যায়)"। Web 2.0 বিপ্লবের এই যুগে এই বিপ্লবের কর্ণধার যারা তারা এই কথাটার যাতে প্রতিফলন ঘটাবে তাদের কর্মকান্ডে এটাই সবার প্রত্যাশা।

** ডিসকভারি চ্যানেলে প্রচারিত Download - The True History of Internet অনুষ্ঠান অবলম্বনে রচিত।*

কৃতজ্ঞতা:

এই পোস্টের কিছু ছবি ও সকল বহির্গামী লিংক উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত